সূ চি প ত্র

প্রথম পর্ব
সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়

সভ্যতা কী? ১৭
সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয় ১৮

দ্বিতীয় পর্ব
সভ্যতায় সভ্যতায় দ্বন্দ্ব

দুটি সভ্যতায় দ্বন্দ্ব কীসে? ২১
পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্র-বিন্দু ২৫
উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতার বিপর্যয় ২৭

তৃতীয় পর্ব
ইসলামি সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ ৩৩
নির্ভুল জ্ঞানের উৎস ৩৪
গণতন্ত্র ৩৫
তাদের এই অবাধ যৌনাচারের আরেকটি নমুনা ৪৫
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম ৪৭
বস্তুবাদের বিশ্বাস ৪৮
ডারউইনিজম ৫০
সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি ৫১
পাশ্চাত্য কী বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন? ৫৮
পাশ্চাত্যে পারিবারিক সংকট ৬০

পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবজাতিকে আর কী-ই বা দিতে পারবে? ৬৭
পাশ্চাত্যে লাগামহীন যৌন স্বাধীনতা ও নৈতিক অবক্ষয় ৬৯
যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা ৭৪
শালীনতা ৮০
ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি ৮৪
সারকথা ৮৯

চতুর্থ পর্ব

সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ

পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি ৯৫
পাশ্চাত্য সভ্যতার এপিঠ-ওপিঠ ১০৩
উন্নত বিশ্বের ব্যাধিগ্রস্ত জাতিসমূহ ১১০
মানবীয় আইন বনাম আল্লাহর আইন ১১৫
মুসলমান কেন পাশ্চাত্যের অনুসারী ১১২
পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসলীলা ১৩২

পঞ্চম পর্ব

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতি

সংস্কৃতির পরিচয় ১৩৭
ইসলামি সংস্কৃতি ১৩৮
ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি ১৩৮
ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ১৩৮
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ১৩৯
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি ১৩৯
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ক্ষুদ্র রূপায়ণ ১৪০
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ১৪০
পশ্চিমা সংস্কৃতির বিশেষ দিবস-রজনী ১৪২
থার্টিফার্স্ট নাইট ১৪২
যেসব কারণে থার্টিফার্স্ট নাইট ইসলামে নিষিদ্ধ ১৪২
এপ্রিল ফুল ১৪৩
ভালোবাসা দিবস ১৪৫
শেষকথা ১৪৬
গ্রন্থপঞ্জি ১৫৩

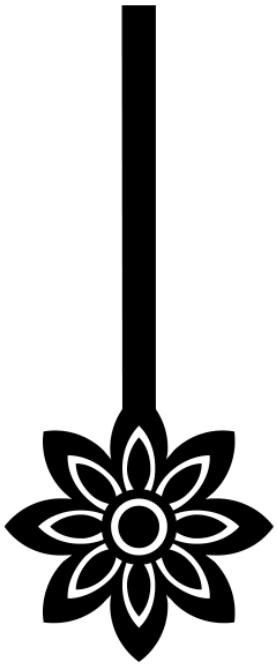

প্রথম পর্ব

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়

সভ্যতা কী?

ইংরেজি Civilization-এর বাংলা অর্থ করা হয়েছে সভ্যতা। সমাজবিকাশের পদ্ধতি বা পর্যায় বিশেষ। Oxford English Dictionary অনুসারে ইংরেজি Civilize শব্দটির অর্থ হলো—আদিম বা অজ্ঞ অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থায় তুলে আনা, সভ্য করা, উন্নত ও শিক্ষিত করা।

বাংলা ভাষায় সভ্যতার আভিধানিক অর্থ হলো শিষ্টতা, সামাজিকতা, জীবনযাত্রা, জীবনযাত্রা প্রণালির উৎকর্ষতা। সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি সভা হতে এবং সভার অর্থ হলো যা সকলকে নিয়ে শোভা পায়, এ অর্থে সভ্যতার অন্যতম অর্থ-সামাজিক সুসংগত। যে অবস্থায় মানুষের সামাজিক জীবন প্রতিভাত হয়, তার বিকাশ বা উন্নতি হয় তাই সভ্যতা। এটি মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালির শোভনতার পরিচয়।

আবার 'সভ্যতা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Civilization যা ল্যাটিন শব্দ Civilis থেকে এসেছে। Civilis এর অর্থ—নাগরিক। ইংরেজি প্রতিশব্দের

বিবেচনায় আক্ষরিক অর্থে সভ্যতা বলতে সুসংহত নগর বা রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের অর্জিত গুণাবলিকে বুঝায়।

সভ্যতা বলতে অনেকে বস্তুগত উৎকর্ষতাকে বুঝিয়েছেন। এ অর্থে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সব বস্তুগত আবিষ্কারের ফলকে একত্রে সভ্যতা বলা হয়; বিভিন্ন প্রকার কারিগরি কলা-কৌশল ও বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা, সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে তারই সামগ্রিক রূপ। কেবল যে আমাদের সামাজিক সংগঠনের নানারূপ রীতি এর অন্তর্গত হয়েছে তা নয়, নানাবিদ কারিগরি কলা-কৌশল ও বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

অথবা বিষয়টি এভাবেও বলা যায়—'সভ্য জাতির জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি-সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও বিবিধ বিদ্যার অনুশীলনহেতু মন-মগজের উৎকর্ষ সাধন।'

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয়

ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা ও ক্রমপ্রবৃদ্ধির জন্য তার দেহ ও প্রাণ বা আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষতা একান্তই জরুরি। এ যেমন সত্য, তেমনি একটি জাতির উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে। কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে দেহ।

অর্থাৎ মানবজীবন দুটি দিক সমন্বিত। একটি বস্তুনির্ভর, অপরটি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক। এ দুটির-ই রয়েছে বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও দাবি-দাওয়া। সে চাহিদা পরিপূরণে মানুষ প্রতিমুহূর্তে থাকে গভীরভাবে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত। একদিকে যদি দৈহিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাকে টানে এবং জীবিকার সন্ধানে সে হয় ব্যস্ত, তাহলে তার আত্মার দাবি পূরণ করার জন্যে তার মন ও মগজ হয় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

তাই মানুষের সূক্ষ্ম ও সুকোমল আবেগ-অনুভূতি এবং আত্মার দাবি ও প্রবণতা পূর্ণ করে যেসব উপায়-উপকরণ, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। সঙ্গীত, কবিতা, ছবি অঙ্কন, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতি এক-একটা জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ-মাধ্যম এবং দর্পণ। আত্মিক চাহিদা পূরণই এগুলোর আসল লক্ষ্য। একজন দার্শনিকের চিন্তা ও মতাদর্শ, কবির কবিতা, সুরকার ও বাদ্যকারের সুর-ঝংকার, এর সবই ব্যক্তির হৃদয়-বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। এসবের

তিনি এর পেছনে দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন, যাকে তিনি এই দ্বন্দ্বের অন্যতম চালিকাশক্তি বলে মনে করেন।

১. মুসলমানরা নিজেদের সংস্কৃতিকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর ও মর্যাদাকর বলে মনে করে। অধিকাংশ মুসলিম গর্বভরে দাবি করে যে, তাদের ধর্ম ইসলাম অন্য যেকোনো ধর্ম বা দর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ। 'ইসলামি জীবনব্যস্থা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'—এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক দাবি হিসেবে তাদের মধ্যে এ ধরনের আত্মবিশ্বাসী মনোভাব জন্ম নিয়েছে। আর এটা মনে করা তো আসলেই যুক্তিসংগত যে, মহান আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের অনুশীলন যে সংস্কৃতির জন্ম দেয়, নিঃসন্দেহে তা মানুষের গবেষণা, আন্দাজ-অনুমানভিত্তিক সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর হবে।

২. মুসলমানদের মনে তাদের দেশে ইসলামি আইন বা শরিয়াহ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা। আলজেরিয়া, মিসর, চেচনিয়া, বোসনিয়া, দাগেস্তান, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, সিরিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে যে অস্থিতিশীলতা বর্তমানে বিরাজমান তা এই স্পৃহারই বহিঃপ্রকাশ। ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক যুগে তারা মুসলিম দেশগুলোর শরিয়াহ ভিত্তিক আইনব্যবস্থাকে ইউরোপিয়ান আইনকাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। আর নব্য সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু নামধারী মুসলমানদের হাতেই শাসন-কর্তৃত্বের লাগাম উঠেছে এবং তারাও সেই ইউরোপিয়ান আইন অনুসারে মুসলিম দেশগুলো শাসন করছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের সরকার ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান এবং ডাচ আইন দ্বারা দেশ শাসন করছে, আর ইসলামি আইনগুলোকে কেবল পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এ কারণে ইসলামের পুনর্জাগরণের ঢেউ মুসলিম বিশ্বকে বারবার আন্দোলিত করছে। মুসলিম জাতির মনে বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার দাবির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রশাসনের সঙ্গে সহিংস সংঘাতের আকারে। ইন্দোনেশিয়ার মতো ৯৫% মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশে সুকর্ত (১৯৪৫-১৯৬৫–) এবং তার উত্তরসূরি সুহার্তোর শাসনামলে (১৯৬৮-১৯৯৮), Pancasilia কে রাষ্ট্রধর্ম বা রাষ্ট্রের মূল দর্শন হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং স্কুলগুলোতে এই দর্শনই শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে ইসলামি আইনকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবর্তন করার দাবিকেই রীতিমত একটি রাষ্ট্রদ্রোহী

অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৮ সালে যখন প্রবল জনরোষের মুখে সুহার্তোর পতন ঘটে, তখন ক্ষমতালোভী প্রতিটি ব্যক্তি, এমনকি সুহার্তোর তল্পিবাহক বি জে হাবিবিসহ সকলেই তৎক্ষণাৎ ইসলামের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ত প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগে। ১৯৯৯ এর নির্বাচনে সুকর্ততনয়া মেঘবতী সুকর্তপুত্রী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন ইসলামি দল আন-নাহদাতুল উলামা'র নেতা আবদুর রহমান ওয়াহিদের কাছে, যিনি প্রায় অন্ধ এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরাও করতে পারতেন না।

অধ্যাপক হান্টিংটন আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-কে মুসলমানদের প্রধান শত্রু মনে করার যৌক্তিকতা নাকচ করে দিয়েছেন। যদিও বিভিন্ন দেশের সরকার পতন এবং অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে সিআইএ'র যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে; কিন্তু তারপরও তিনি বলছেন যে, সিআইএ মুসলমানদের প্রধান শত্রু নয়। তিনি আমেরিকান সেনাবাহিনীকেও এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন; যদিও সৌদি আরবের মাটিতে এই সেনাবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং ইরাককে ধ্বংস করেছে, সুদান এবং আফগানিস্তানে মিসাইল আক্রমণ করেছে এবং প্রকাশ্যে ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে আসছে।

সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে অধ্যাপক হান্টিংটন বলেন, মুসলিম বিশ্ব প্রধান যে সমস্যা মোকাবিলা করছে, তা হলো—স্বয়ং পশ্চিমা সভ্যতা; এটা নিছক সিআইএ'র ষড়যন্ত্র বা আমেরিকান সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের বিষয় নয়। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, এ সমস্যার মূলে রয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা কর্তৃক নিজেদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জীবনধারাকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতির চেয়ে উন্নতর মনে করা। পশ্চিমারা মনে করে, অন্য সকলের উচিত আমাদের সভ্যতা মেনে নেওয়া, আমাদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা এবং সে হিসেবে জীবনযাপন করা।

তাদের এই বিশ্বাসের পেছনে মূল কারণ হলো, ডারউইনিজম। এ তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং একটি ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানবসমাজ এগিয়ে যেতে থাকে। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের কল্পিত পূর্বপুরুষ বানর থেকে সূচনা করে এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানবসমাজের ধারাবাহিকতায় অগ্রগতি হয়ে আসছে। গত কয়েক শতক জুড়ে বিবর্তন তত্ত্বের 'যোগ্যরাই টিকে থাকে' শীর্ষক নীতির ভিত্তিতে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মানবসভ্যতার শীর্ষস্থানটি দেওয়া

কিন্তু এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ এবং নির্মম তা তাদের থেকেই আমরা দেখতে পাই। পশ্চিমা দেশে এমনও ঘটনা ঘটে যে, আধুনিক চাকচিক্যময় বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি মরে পড়ে থাকে, তাদের দাফনের জন্য কোনো পুত্র-কন্যা বা আত্মীয়-স্বজনকে পাওয়া যায় না। সরকারের পুলিশ এসে তাদের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করে। তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছ থেকে এর চাইতে মানবিক কোনো আচরণ প্রত্যাশা করা যায় কি? প্রকৃত অর্থে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসে বিবাহ, পারিবারিক সম্পর্ক, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য, আত্মীয়তার বন্ধন, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার তথা সামাজিক বন্ধন ও প্রশান্তির যে গুরুত্ব দিয়েছে তার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত বটে, তবে এ কাজটি বাধাহীনভাবে উৎসাহিত করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, ইসলামি শরিয়তে যতগুলো জায়েজ বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় একটি জায়েজ বিষয় হলো—তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ। ইউরোপ-আমেরিকাসহ চীনে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, বিবাহ বহির্ভূত জীবন-যাপনে মানুষ যে হারে উৎসাহিত হচ্ছে এবং সেসব দেশে পারিবারিক সম্পর্ক যে হারে ভেঙে যাচ্ছে তা পশ্চিমা সমাজের একটি ব্যাধি বৈকি।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, পশ্চিমাদের কাছে নারী কেবল ভোগের বস্তু বৈ কিছুই নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে একশ্রেণির জ্ঞানপাপীরা এ কথা বলে বেড়াচ্ছে যে, ইসলাম নারীকে পর্দার বেষ্টনীতে আটকে রেখে তাদের কেবল ভোগের বস্তু বানাতে চায়। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতায় নারীর অবস্থানটা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সেই সাথে ইসলামপূর্ব যুগে নারীর অবস্থা ও বর্তমানে অন্যান্য ধর্মে বা সমাজে নারীর অবস্থানও তুলে ধরছি :

হিন্দুস্থানে নারী

হিন্দুস্থানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'মনু সংহিতা'য় পিতা, স্বামী কিংবা দুজনের মৃত্যুর পর পুত্রহীন নারীর স্বতন্ত্র-ব্যক্তিগত কোনো অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আর পিতা, স্বামী ও পুত্র; এই তিন জন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোনো এক পুরুষ-আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা আবশ্যক ছিল। সে কোনো অবস্থাতেই তার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল না। জীবিকার ক্ষেত্রে তার অধিকার বঞ্চনার চাইতেও বেশি নির্মম ছিল স্বামীর বিয়োগপরবর্তী জীবনে বেঁচে থাকার অধিকারের

সামাজিক অস্বীকৃতি। সমাজ মনে করত স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যার ফলে স্বামীর মৃত্যুর দিন 'সতীদাহ'ই (স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মরা) ছিল এমন নারীর অবধারিত নিয়তি। এই প্রাচীন রীতি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে ১৭ শতক পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির মুখে এর বিলুপ্তি ঘটে।

ফ্রান্সে নারীদের সম্পর্কে ধারণা

উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের কথা উল্লেখ করছি, ফ্রান্সে নারীদের সম্পর্কে ধারণা ছিল, নারীই হলো সমাজের যত অনিষ্ট ও অকল্যাণের কারণ।

চীনে নারীদের সম্পর্কে ধারণা

চীনে নারীদের সম্পর্কে ধারণা হলো, তাদের মধ্যে শয়তানের প্রেতাত্মা থাকে। ফলে নারীই হলো সমাজের যত অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলার একমাত্র ভিত্তি।

জাপানে নারীদের সম্পর্কে ধারণা

খ্রিষ্টবাদ বৈরাগ্যতার আবিষ্কার করেছে। ফলে তাদের আলিমদের মত হলো, দাম্পত্যজীবন আল্লাহর মারিফত তথা পরিচয় লাভের প্রতিবন্ধক। সুতরাং তাদের শিক্ষা হলো, পুরুষরা পুরোহিত হয়ে থাকবে আর নারীরা নান হয়ে থাকবে। নারী-পুরুষ সকলেই একাকী জীবনযাপন করবে, তাহলেই আল্লাহর মারিফাত লাভ করা সম্ভব হবে। তারা দাম্পত্যজীবনকে এর জন্য প্রতিবন্ধক মনে করে থাকে।

হিন্দু ধর্মে নারীদের প্রতি আচরণ

হিন্দু ধর্মে কোনো নারীর স্বামী বিয়োগ হলে সেই যুবতীকে অলুক্ষণে মনে করা হয়। ফলে তার স্বামীর লাশ পোড়ানোর সময় তাকেও স্বামীর সাথে চিতায় আত্মহুতি দিতে হতো। তাদের ইচ্ছানুযায়ী, এভাবে সে নারী তার সতীত্ব রক্ষা করত। এটিকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়। যদি কোনো নারী এরূপ আত্মহুতি না দিত তাহলে হিন্দু সমাজে তার সম্মানজনক অবস্থান ও জীবনযাপন সম্ভব হতো না।

বলে ঘোষণা করেছে ইসলাম। ধর্ম মতে, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই দাম্পত্য জীবন সুখী ও সমৃদ্ধ হয়। স্বামীর উপর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বামী ও স্ত্রীকে তাদের পারস্পরিক যৌন অধিকার মেনে চলতে বলা হয়েছে। মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাবাকে। পাশাপাশি নারীর উপরও বেশ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্তান লালন-পালনে মায়েদের ভূমিকাই থাকে সবচেয়ে বেশি। এ কারণে নারীকে পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কঠিন দায়িত্বের বাইরে রাখা হয়েছে। সর্বোপরি পরিবারের সব সদস্যকে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম ব্যক্তি স্বার্থে নৈতিকতাসহ পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করার অধিকার কাউকে দেয়নি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবজাতিকে আর কী-ই বা দিতে পারবে?

ইতিহাস এ কথার বলিষ্ঠ সাক্ষী যে, বিশ্বে যখন মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। পাশ্চাত্য জগতে তখন সভ্যতার ছোঁয়াই লাগেনি। আজ যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত শিক্ষার জন্য মুসলিমরা পাশ্চাত্যে যেতে বাধ্য হয়, তেমন ঐ সময়ও পাশ্চাত্য দেশ থেকে উন্নত শিক্ষার জন্য মুসলিমদের পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী হিসেবে তারা আসত। মুসলিম জাতি যখন ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় অবহেলা করল, তখন পাশ্চাত্যে তাদেরই শাগরিদরা সাধনা-গবেষণায় এগিয়ে গেল। ঐ অগ্রগতির ফলেই তারা ১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলোকে দখল করতে সক্ষম হয়।

পৃথিবীতে যত দিন ইসলামি সভ্যতার নেতৃত্ব চালু ছিল তত দিন মানবজাতির জীবনে তেমন কোনো বিপর্যয় দেখা দেয়নি। কারণ, ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ তাদের অমানবিক কাজ থেকে বিরত রাখত। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য কায়েম হওয়ার পর মানবজাতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, তারা Divine Guidance-এর ধার ধারে না বলে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনুযায়ী যে দেশই দখল করেছে সেখানে জনগণকে ভয়ংকর নির্যাতন করেছে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জঘন্য পাশবিক আচরণ করতেও দ্বিধা করেনি। বর্তমানে ইরাক ও আফগানিস্তান এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের দলে দলে শিকারী পশুর ন্যায় বন্দি করে তারা আমেরিকায় নিয়ে দাস হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিজিত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন